মা

এলোমেলো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আছাড় খেলো সাজু। ওর বয়স এখন তেরো মাস। ছোট্ট লাল টুকটুকে গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে নিরন্তর হাঁটার চেষ্টা করছে। তাকে খেলতে দিয়ে ঘর সামলায় সালেহা। এই তো একমাত্র সন্তান সাজু। রেহান শহীদ হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। ওর বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সৌধও গড়ে উঠেছে এলাকায়। তবে রেহানের অকাল মৃত্যু সালেহাকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি ঠেলে দিয়েছে। কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিলো রেহানের যা সহজ জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। ছেলের চিৎকারে হাতের কাজ ফেলে প্রায় দৌড়ে এলো সালেহা। সাজুর পা লেগে গ্লাস কাত হয়ে যাওয়ায় মেঝে পানিতে সয়লাব। পিছল মেঝে থেকে সাজুকে বুকে তুলে নিলো সালেহা। সাজু আধো আধো স্বরে বলছে—মাম্মুন, ই ই, কস্ত।

সাজু মামা বা আম্মা বলে ডাকে না সালেহাকে। কোত্থেকে একটা কঠিন শব্দ শিখে নিয়েছে—মাম্মুন। বারবার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে সে। সালেহা ওকে বুকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সান্ত্বনা দিচ্ছে—না না সোনামনি, এইতো ব্যথা সেরে যাবে। না না বাবা কাঁদে না, চাঁদ আমার, সোনামনি আমার, চাঁদের বুড়ির গল্প বলবো তোমাকে, ঘুমপাড়ানি গান শোনাব আমার সোনামনিকে। সালেহার চোখের কোণে পানি, ওর ভালবাসার রেহানের একমাত্র চিহ্ন। সাজুকে আঁকড়ে ধরলে ওর শরীর থেকে কেমন যেন রেহানের গন্ধ আসে।

২

সাজু এখন স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। পাঁচ বছর পার হলো দিন কয়েক আগে। ওর জন্য কোন রকমে বছরে দু'টো প্যান্ট দু'টো শার্ট জোগাড় করতে সালেহার প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। সেই বড় ঘরে ওরা এখন আর থাকে না। রেহান শহীদ হবার বছর দুই পরে ধীরে ধীরে তিন ফুপু এবং দুই চাচা জমিজমা ভাগাভাগি করার জন্য ভদ্রভাবে দাবি করলো।

রেহানের বড় ভাই মোত্তালিব বললো—বৌমা, বাবার জমিজমা ভাগ না করলে চলবো কেমনে? আমাদের ছেলেরাও তো বড় অইতাছে।

সাজুর ফুপুর স্বামী আবার আইনজ্ঞ। ফুপু বললো—ভাবিজান, ধর্মের কথা তো মানতে অইব। আমাগো পাওনা চাইলে তোমাদের তো কোন লোকসান নাই। আর আমাদের সাথে অধর্ম করাটা তোমাদের উচিত না। কি কও? উচিত তো না।

নিজে প্রশ্ন করে নিজেই তার জবাব দিয়ে বিজ্ঞের মতো তাকালো এদিক ওদিক। রায়তো দিয়েই দিয়েছেন।

উপস্থিত সবাই বললো—ঠিক, ঠিক। তুমি একদম ধর্মের কথা কইছ। এগুলো অইলো আল্লার দেওয়া বিধান, মানুষ ভাঙ্গনের কেডা?

সালেহা আর কি বলবে ! ওর সম্মতি বা অসম্মতির কেউ তোয়াক্কা করলো না। ভাগ হলো ঠিকই। কিন্তু ভাগের সময় দেখা গেলো রেহানের ভাগে সবচেয়ে কম। সে নাকি কার কার কাছে বিভিন্ন ভাবে দায়বদ্ধ ছিলো। ছোট্ট সাজুকে নিয়ে সালেহার সংসার চালানোর মতো জমি রেহানের ভাগে কেউ দিলো না। পশ্চিমের মাঠের সবচেয়ে বড় ধানি জমিগুলো নিলো রেহানের বড় ভাই। নিজামদের বাড়ির দুই বিঘার উপর বড় বাগানটা নিলো ওর ছোট ফুপু। ছোট চাচা ফসলের ভাল জমি না পাওয়ায় দক্ষিণের মাঠ থেকে কিছু বেশি জমি নিজেই খুঁটি পুঁতে দখল করে নিলো। সাজুর অন্য ফুপুরাও কম পেলো না। ঘরের ডিনার সেট, চামচ, বাটি ভাগ করলো সব।

সাজু মার আঁচল ধরে বললো—মাম্মুন, ফুপুলা এগুলো নিয়ে দোকান দেবে?

সালেহা চোখের পানি মুছে বললো—তোমার দাদার সময়ের কেনা, তাই এরা কিছু কিছু নেবে।

সাজুর ছোট ফুপু মা-ছেলের কথোপকথন শুনলো। সালেহার দিকে ফিরে তাকালো। তার কপালে স্পষ্ট বিরক্তির কুঞ্চন। বললো—ভাইয়ের ছেলেটাকে পাজি বানিওনা ভাবি। এমন কিছু বলো না যাতে বড় হলে আমাদের সম্মান না করে । তার কথার মধ্যে অবহেলা আর অহঙ্কার স্পষ্ট।

মা'র আঁচল ধরে ফুপুর দিকে অবাক তাকিয়ে থাকলো সাজু। সালেহা তখন চোখের পানি মুছছে। সাজু তার ফুপুর কথার কাঠিন্য আর তিরস্কার যেন বুঝতে পারছে। সে ওর মার দিকে ফিরে বললো—মাম্মুন, পাজি কী?

এ কথার জবাব দিতে পারলো না সালেহা। ওর বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। ছেলের হাত ধরে দ্রুত অন্য ঘরে চলে এলো সে।

সালেহা সব চেয়ে অবাক হলো যখন সবাই মিলে মিস্ত্রি নিয়ে এসে বললো—ঘরের টিনের এবং খুঁটির ভাগ নেবে এবং নিলো প্রায় জোর করে। বসে বসে দেখলো সালেহা। বিরাট ঘর দু'দিনে জনা দশেক মিস্ত্রি লাগিয়ে খুলে ফেললো সবাই মিলে। একটা বারান্দা কোন রকমে আঁকড়ে রইলো সালেহা।

সাজু অবাক হয়ে দেখল সব—এক সময় ভয় পেয়ে কাঁদতে শুরু করলো। ওকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বারান্দায় বসে থাকলো সালেহা।

সাজু মা'র লাল টকটকে ফুলো চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বললেন—ওলা ঘল ভাঙছে কেন মাম্মুন? ওলা কি আমাদেল মালবে।

সাজু এখনো 'র' উচ্চারণ করতে পারে না। সালেহা ওকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বললো—না, শুধু ভাগ করছে।

কোলের ভিতর গুটিসুটি বসে থাকলো সাজু।

বললো—ভাগ কী, মাম্মুন?

নিজের অংশ বুঝে নিচ্ছে তারা।

আমাদেল কিছু নাই? আমলা থাকব কই?

চুপ কর বাবা। আল্লাহ যেখানে রাখেন সেখানেই থাকবো। সাজু মা'র অশ্রুঝরা চোখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বললো না, শুধু গুটিসুটি মেরে কোলের মধ্যে আরো সেঁধিয়ে গেলো ।

কষ্টের দিন ফুরাতে চায় না কিন্তু তবুও এগিয়ে চলে জীবনের চাকা। সাজু এখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। গেলো দু'মাস বেশ খানিকটা লম্বা হয়েছে সে। সালেহা মাঝে মধ্যে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, হয়তো লম্বায় ও রেহানকেও ছাড়িয়ে যাবে।

লেখাপড়ায় ভাল হয়েছে সাজু। স্কুলের হেডমাস্টার একদিন এসে বললো—ভাবিজান, আপনার বাচ্চা রেহান ভাইয়ের মতোই শার্প, ভদ্র এবং পরিশ্রমী। ও জীবনে উন্নতি করবে। দুঃখের মাঝেও একটা চেনা আনন্দ বারবার ঘিরে রাখে সালেহাকে। বহু কষ্টে একটা সেলাই মেশিন জোগাড় করেছে। হাতের কিছু কাজ জানে। সামান্য যে ধান হয় তাতে মাস দু'য়েক কোন রকম চলে যায়। সংসারের হাল ঠিক রাখতে সেলাই মেশিন চালিয়ে হাতে কড়া পড়ে গেলো ওর।

সামনের উঠানে সাজু খেলছে। কি কারণে যেন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। চমকে উঠলো সালেহা—আরে ঠিক যেন রেহান হাসছে। সেলাই মেশিন চালাতে চালাতে সস্নেহে বারবার উঠানের দিকে তাকিয়ে সাজুকে দেখতে থাকলো সালেহা। আহা, তার রেহানের একমাত্র স্মৃতি! তার ভালবাসা!

৩

বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে সালেহার চেহারায়। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ সাজুকে নিয়েই অন্য কোন ঘরে নিজের সুখের ভবিষ্যৎ গড়ার পরামর্শ দিয়েছিলো। কিন্তু সালেহা এক কথায় সবাইকে না করেছে। সালেহার সাফ জবাব—ভাগ্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। তা না হলে সাজুর বাবা অকালে শহীদ হবেন কেন!

আজকে সাজুর এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। স্ট্যান্ড করেছে বোর্ডে। মেধা তালিকায় তৃতীয়। শিক্ষকরা ভিড় করেছেন বাড়িতে। অংক শিক্ষক বললেন—ভাবি, আপনার ছেলের জন্য আমরা গর্বিত। আমাদের স্কুলের জন্য ও সুনাম বয়ে এনেছে।

সালেহা সবার জন্য কিছু তেলেমাখা মুড়ি দিলো। কয়েকজন শিক্ষককে দিলো গ্লাসে করে অল্প অল্প শরবত। দোয়া চাইলো ছেলের জন্য। সবাই উঠলে সাজুকে বললো—চলো বাবা আমার সাথে

কোথায় যাবে মা?

সালেহা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। বললো—তোর বাবার মতো সব কথায় খালি প্রশ্ন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললো—তোর বাবার কাছে যাব।

সাজু ওর মা'র দিকে অবাক চোখে তাকালো। বললো—তার কাছে যাবে কী করে?

সালেহা হেসে বললো—বোকা ছেলে, তোর বাবার কাছে নয়, তাঁর স্মৃতির কাছে, চল চল, বেশি কথা না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গেলেই সদর রাস্তা। পাশেই

স্কুল। স্কুলের বড় মাঠের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ। মা ছেলে এসে দাঁড়াল এর কাছে।

সালেহা এখানে এলে হাসি ভুলে যায় প্রতিবার। এবারও গম্ভীর হয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর হাত দিয়ে শুভ্র স্তম্ভটা একটু ছুঁয়ে দেখলো

এখন সময় ফিরে তাকালো সাজুর দিকে। বললো—তোর বাবাকে নিয়ে এলাকাবাসী এক সময় গর্ব করতো। আমি চাই, তুই বড় হয়ে এখানকার মাটি ও মানুষকে ভুলবি না। বড় হয়েছিস, এর পর শহরে যাবি। তোর হৃদয়ের গ্রন্থিতে যেন গেঁথে থাকে এ গ্রামের প্রতিটি কণা। যেন মনে থাকে এ গ্রামের কথা, এখানকার মানুষের কথা।

বেশ লম্বা চওড়া হয়েছে সাজু। এগিয়ে এসে মার মাথায় হাত রাখলো। বললো—মা, তোমার কথা আমার মনে থাকবে। তবে তোমাকে ছেড়ে আমি শহরে থাকতে পারবো কি না জানি না!

পারবি পারবি, তোকে পারতেই হবে। আমার সমস্ত জীবনের ত্যাগ বিফলে যেতে পারে না। যখন লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করবি তখন আমাকে নিয়ে যাস। বলে ছেলের মুখের দিকে সস্নেহে তাকালো সালেহা।

সাজু ওর মা'র কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়লো। বললো—তুমি আছ বলেই আমি আছি, গাছের সাথে পাতার মতো। তুমি নেই, তো আমার অস্তিত্বও নেই। তুমি বললে আমি পারবো। তবে তোমাকে ছাড়া পুরো একদিন কোথাও থাকিনি কোন দিন।

আমার স্মৃতি আর ভালবাসা থাকবে তোর সাথে। চল এখন বাড়ি যাই। ছেলের হাত ধরে বাড়ির পথ ধরলো সালেহা।

৪

কলা ভবনের পশ্চিম দিকের খোলা মাঠে বসে আছে সাজু। অলকা চুপচাপ। একটা ছেলে বাদাম বিক্রি করছে। অলকা ছেলেটাকে হাতের ইশারায় ডাকলো। জিজ্ঞেস করলো—দাম কত রে?

পঞ্চাশ গ্রাম পাঁচ টাহা, আফা দিমু?

একশ' গ্রাম দে, বলে দশ টাকা বাড়িয়ে দিলো ছেলেটার দিকে।

আসন গেড়ে বসে কোলের মধ্যে যত্ন করে রাখলো বাদামগুলো। আয়েস করে চাপ দিয়ে খোসা ছাড়াচ্ছে অলকা। গরম টাটকা বাদামের খোসা ছাড়াতেও মজা। চাপ দিলে মুড় মুড় শব্দে ভেঙে যায়। বেশ কয়েকটা বাদামের খোসা ছাড়িয়ে হাতের তালুতে নিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিলো সেগুলোর ওপর। বাম হাতটা উঁচু করে ফুঁ দিতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো হালকা বাদামি জঞ্জাল। সাজুর হাতে ধরিয়ে দিলো ক'টা। বললো—খাও আর চিন্তা করো। বাপ্পিকে বলে স্টেট্স্ এ এতো বড় স্কলারশিপটা জোগাড় করলাম আর তুমি কিনা বলেছো মাকে ফেলে যাবে না। কেমন তরো সুপুত্র হে তুমি?

সাজুর হাতে বাদামগুলো নিয়ে নাড়তে নাড়তে বললো— মাকে কোন দিন সুখ দিতে পারিনি। এখানকার ইউনিভার্সিটির অফারটাও তো মন্দ নয়। বছর চারেক পরে এরাও আমাকে পিএইচডি করতে পাঠাবে। এই কতটা বছর মা-কে নিয়ে থাকলে তিনি অন্তত কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন।

অলকার গলায় আহলাদি উস্মা। সাজুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাদাম চিবুতে চিবুতে বললো—হে মিস্টার, আমার কি গতি হবে। আমাদের বিয়েটা কি চার বছর পিছিয়ে দিতে চাও? ছোট্ট একটা জীবন, তারও যদি আবার চার চারটা বছর বিনে কারণে ঝরে যায়। না না সাজু, এভাবে চিন্তা-করনা। বলতে বলতে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো অলকা।

সাজু দু'টো বাদাম মুখে পুড়লো। ঘাসের উপর ছড়িয়ে দিলো পা। হালকা বাতাসে ওর ভাল লাগছে। তা ছাড়া শান্ত প্রকৃতির সাজু'র অলকাকে ভালই লাগে। মাকেও ঈঙ্গিতে বলেছে কয়েকবার অলকার কথা, বড়লোকের আদুরে মেয়ে।

সালেহা হেসেছে ওর সঙ্কোচ দেখে। তারপর অসঙ্কোচে সম্মতি দিয়েছে ছেলেকে। তবে এক শর্ত অবশ্য জুড়েছে এর সাথে। আদর করে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে—সাজু, তুই কে তা যেন আবার ভুলে যাস নে বাবা।

অলকা সাজুর একটা হাত তুলে নিজের হাতে। বললো—দেখ, জীবন যুদ্ধে পিছিয়ে পড়তে নেই। লস অ্যাঞ্জেলেসে বাপ্পি আমার নামে একটা বাড়ি কিনে দিয়েছেন। ওখানে আমরা দু'জন থাকব আর পড়শুনা করবো। তোমার পিএইচডিটা হয়ে গেলে দেশে ফিরে এসো। আর না হয় তোমার মাকে ওখানে নিয়ে যেও

উদাস হয়ে আছে সাজু। স্বগোতোক্তির মতো করে বললো—মা হলেন জেদি আর নিজ সিদ্ধান্তে অটল এক অটুট পাহাড়। মনে হয় না, তিনি বাবার স্মৃতি ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে চাইবেন।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো অলকা। ওমা সেকি! তাই বলে তোমার এতো বড় ক্যারিয়ার ছেড়ে দেবে! শোন, ভেরি গুড বয়। তোমার মা বরং খুশিই হবেন। তোমার কৃতিত্বে তিনি উপচে-পড়া আনন্দে ভাসবেন। দেখলাম তো, তোমার রেজাল্ট দেখে তোমাকে জড়িয়ে ধরে কি ভাবে কাঁদলেন।

হঠাৎ সাজুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে অলকা ওর বক্তব্যে ব্রেক কষলো। দেখলো, ওর চোখের কোণে টল টল করছে কয়েক ফোঁটা পানি। মা'র কথা বললেই সাজু খুব ইমোশনাল হয়ে যায়। বেশ কয়েকবার দেখেছে অলকা। কিন্তু ব্যবসায়ী বাবার হিসেবি মেয়ে, ওর মতো ভাল ছেলেকে হারাতে চায় না কিছুতেই।

অলকা ওর পিঠে হাত রাখে। তারপর মাথায় চুলে বিলি কেটে দিলো কতক্ষণ। সাজুকে সংবরণ করতে সময় দিলো অলকা। তারপর আস্ত আস্তে বললো—আমি জানি তোমার মা অতুলনীয়া। তুমি তাঁকে বলো, তিনি সানন্দে তোমায় সম্মতি দেবেন।

তা হয়তো দেবেন। আমতা আমতা করে বললো সাজু। তবে মা আমাকে আর আমার অস্তিত্বকে নিয়ে বেঁচে আছেন। আমি কাছাকাছি না থাকলে তাঁর বড্ড কষ্ট হবে, আমি পরিষ্কার অনুভব করছি।

অলকার কণ্ঠে কিছুটা বিরক্তি। বললো—তুমি বড় হলে গর্বে ওনার বুক বড় হয়ে যায় তা কি চোখে দেখতে পাও না? তোমার সফল প্রতিষ্ঠাই তাঁর একমাত্র কামনা।

হয়তো! বলে উঠে দাঁড়াল সাজু। বললো—চলো, আজকে আমার মনটা ভাল নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অলকা উঠলো। হাঁটা শুরু করলো সাজুর সাথে সাথে। অনাগত ভবিষ্যতের সুবিশাল স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে তার চোখে।

৫

শেষপর্যন্ত তড়িঘড়ি সাজু ওর মাকে নিয়ে এলো ঢাকায়। দেশের দু'চারজন মুরব্বিকে বিয়ের দাওয়াত দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও ওর মা সময়ের অভাবে তো করতে পারেন নি।

আয়নাল সাহেব তার বিশাল বাংলোর এক কোণে সুন্দর খাটে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। সাজু বারবার মা'র খোজ খবর নিলো। খবর রাখলো অলকাও। কিন্তু আয়নাল সাহেব এবং তার সমাজ সেবিকা স্ত্রী লায়লা হোসেন অতি সাধারণ চলাচলনের বেয়ান সাহেবাকে নিয়ে খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। বিয়ের ঝামেলা মিটতে নাভানা চুরুটের এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আয়নাল স্ত্রী লায়লাকে বললো—মেয়েটার বিয়ে হওয়ায় একটা ঝামেলা মিটলো, কিন্তু বেয়ান সাহেবার ঝামেলা কতো দিন পোহাবে?

লায়লা হোসেন সারাদিন কষ্ট করেছে। মুখে হাসি ঝুলিয়ে বিশিষ্ট মেহমানদের আপ্যায়ন করেছে সারাক্ষণ। ক্লান্তিতে হাই তুলতে তুলতে বললো—ওরা স্টেটস্-এ থাকবে, ঝামেলা এমনিতেই বিদেয় হবে। তবে যাই বলো, আমার কিন্তু কোন খেদ নেই। এই রকম একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি মেয়ে জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

আয়নাল হোসেনকে তৃপ্ত মনে হলো না। বললেন—অলকা আমাদের আদরের মেয়ে, যথেষ্ট হিসেবিও। ও রাজি হওয়ায় আমি সাহস পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটা অতি সাধারণ পরিবারের ছেলের সাথে আমার মেয়েকে দেখতে চাই নি। কেন জান? বলে ফিরে তাকালো স্ত্রী'র দিকে?

লায়লা হোসেন কিছুটা বিরক্ত হলো। বললো—জানব না কেন? এখন আর জেনেই কী লাভ? তবে আমি বলে রাখলাম, ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ঢাকা ইউনিভর্সিটিতে কেউ করেনি। একবার পিএইচডি-টা করুকই না, দেখবে ওর নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাবে।

তোমার তো অনেক টাকা। আচ্ছা বলো তো, তোমাকে ক'জনে চেনে? বলে জিজ্ঞাসুনেত্রে লায়লা স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল।

আয়নাল হোসেনের মনে একটা চাপা দুঃখ আছে। তার স্ত্রী'র চাহিদা যশ ও প্রতিপত্তি এবং সাথে সাথে প্রাচুর্যের। শেষেরটা ব্যবসায়িক সাফল্যের সাথে সাথে এসেছে বটে। ঢাকা শহরে তাকে অনেকে চেনেও। কিন্তু সারাদেশে একনামে সবাই চিনবে সেটা মনে হয় তার জীবদ্দশায় সম্ভব নয়।

একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আয়নাল। সব সময় বিছানায় যাবার আগে তিনি পরিপাটি করে চুল আঁচড়ান। সরাসরি ফ্রান্স থেকে আনানো পারফিউম মাখেন। হালকা

সিল্কের একটা স্লিপিং গাউন পরে আজ নিজেকে আয়নার সামনে নেড়ে চেড়ে দেখে নিলেন কিছুক্ষণ। একবার জানালার পর্দা খুলে আকাশ দেখলেন। আজ আকাশে ঝিকমিক করছে অসংখ্য তারা। জোৎস্না থাকলে মাঝে মধ্যে ছাদেও চলে যেতে ইচ্ছে হয় কিন্তু আজ আর ইচ্ছে করছে না। শোবার আগে এসি অন করার অভ্যাস। আজও তার কোন ব্যতিক্রম হলো না। হালকা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ডিম লাইটের সুইচ অন করলেন। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন—সাজুকে বলে দিয়েছি, তার কোন টাকা পাঠাবার দরকার নেই। বেয়ান সাহেবার ব্যয় ভার আমি বহন করবো।

লায়লা খোলাচুলে স্বামীর পাশে এসে বসলো। বললো—তা, সাজু কী জবাব দিলো?

কিছুটা অস্বস্তি প্রকাশ পেলো আয়নাল হোসেনের মুখভঙ্গিতে। কি আর বলবে! বারণ করেছে আমাকে। বলেছে তার মা জানলে নাকি কখনো সে টাকা নেবে না।

তারপর? চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকলো লায়লা।

আয়নাল হোসেন সামান্য হাসলেন। বললেন—তারপর আর কী? অলকা কথার মাঝে এসে পড়ায় সমাধান মিললো একটা। ওদের নামে আমিই টাকা পাঠাব। শুধু শুধু অতদূর থেকে টাকা পাঠাবার কী দরকার? বললেন আয়নাল।

লায়লা হোসেন গম্ভীর হয়ে বললো—জামাইয়ের এই গোঁ ধরার স্বভাবটা আমার বেশি ভাল লাগে না, আর সবই ঠিক আছে। তারপর একটু থেমে বললো—ছেলেটা জেদি এবং তেজি। এ রকম ছেলেরা সাধারণ ঘরের হলেও অসাধারণ সাফল্য পায় জীবনে, যদি সুযোগের সিঁড়িটা ধরিয়ে দেয়া যায়।

কোল বালিশটা টেনে নিয়ে আয়নাল হোসেন পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। তারপর স্বগতোক্তির মতো করে বললেন—সেই জন্যই তো এতো তাড়াহুড়ো করে ওদের বিয়েটা দিলাম।

কিছুক্ষণ পরই ভেসে আসতে লাগলো আয়নাল হোসেনের নাসিকা গর্জন। লায়লার পরিচিত বিভিন্ন মাত্রা ও লয়ের এই শব্দ খুবই অপছন্দের। কিন্তু কিইবা আর করার আছে। সে মাথার নিচ থেকে একটা বালিশ নিয়ে কানের ওপর দিয়ে উল্টো দিকে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বাইরে আলোকসজ্জায় সজ্জিত বাড়ির বিভিন্ন অংশের বাতিগুলো দূর আকাশের তারাদের মতো জ্বলছে আর নিভছে বিরতিহীন।

৬

সালেহা ফিরে এসেছেন গ্রামে। বেয়াই সাহেব তাকে রাখতে চেয়েছিলেন কিছুদিন, তাঁর ভাল লাগেনি। নিজের পরিবেশে নিজের মতো করে থাকতেই বেশ আনন্দ। যেখানে স্মৃতি রয়ে গেছে সালেহা সেই বৃত্তের বাসিন্দা। কোনভাবেই সে অন্য বৃত্তের বাসিন্দা হতে পারল না, ওর মন সায় দেয় নি। আসার সময় বেয়াই সাহেব সাজুর ঠিকানা পাঠাবে বলেছিলেন। তাও এতদিনে পৌঁছলো না। প্রায় ছ'মাস হতে চললো।

সাজুর চিঠিও আসে না। প্রথমে একটু অবাক হলেও ধীরে ধীরে আবার সেলাই মেশিনের কাজে মনোনিবেশ করল সে। সময় কাটানোটা বড় কথা নয়, সংসারও তো চালাতে হবে।

মাঝে মধ্যে কড়া পড়া হাতের দিকে তাকিয়ে একা একা হাসে সালেহা। বলে—সাজু, বাবা, তুই ফিরে এলে আমাকে নিশ্চয়ই এ কাজ করতে হবে না। তখন তুই আমাকে ভাল বাড়ি বানিয়ে দিবি। লোকে বলবে মুক্তিযোদ্ধা রেহানের বাড়ি। ভাবতে ভাবতে খুশিতে ভরে ওঠে মন। পর মুহূর্তে আবার উদাস হয়ে যায়।

কষ্ট এখন তার নিত্য সংগী। নতুন করে যেন সংগ্রামী জীবনের শুরু। কিন্তু যা তিনি প্রথম দিকে সাজুর ছেলেবেলায় করতে পেরেছেন এখন যেন তা করতে গেলে কেমন ফাঁপর লাগে। তবুও তাকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ সংগ্রহ করতে হয়।

রমিজরা পয়মন্ত গেরস্ত। রমিজের মা সালেহার সুখ-দুঃখের ইতিহাস জানে। একপাশে টেনে নিয়ে সালেহাকে বললো—বুবু, তোমার তো অক্ষণে কষ্ট করার কথা না।

সালেহা কিছুটা অপ্রস্তুত হল। বলল—সাজুর এই বারের পড়াটাই শেষ। সবাই বললো, ও নাকি সারা দুনিয়ায় নামি দামি হবার যোগ্য বুবু। আমি না বললে সাজু বিদেশ যেতো না। কিন্তু আমার সামান্য সুখের জন্য ওর বড় ভবিষ্যৎ বন্ধ করা, মা হয়ে পারলাম না।

রমিজের মা বললো—বুবু, তুমি কিন্তু সামান্য কাজেই কষ্ট পাও, দম ছোট হয়ে যায়। আমার মনে হয় তোমার ডাক্তার দেখানো দরকার। সামান্য হাসল সালেহা। হাসতে হাসতে বলল—বুবু, আমার সাজু আসলে দেশের বড় ডাক্তারের কাছে যাবো। দেখবা, কোন অসুখ তখন আর থাকবে না। তারপর খানিকটা থেমে বলল—বরং তোমাদের রমিজের বাচ্চা-কাচ্চার কাপড়গুলো আমি বানিয়ে দিই। তোমাদেরও কষ্ট লাগলো না, হয়ে গেলে আমিই পৌঁছে দেবো।

রমিজের মা আর কিছু বললো না। শুধু ক'টা জামা ও ফ্রকের মাপ দিয়ে বললো—বুবু, যত্ন কইরা বানাইও। আজ কালকাইর বাচ্চা, একবার পছন্দ না অইলে আর দিতে চাইব না।

সে তোমাকে ভাবতে হবে না, যত্ন করেই বানাবো। বলে চলে এলো সালেহা। আসতে আসতে খেয়াল করল আকাশে মেঘের আনা গোনা। হালকা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওঁর বুক চিড়ে। না, এবারের বর্ষায় ভিজতেই হবে। সেই কবেকার পুরান টিন। আর তো পাল্টান হলো না! কেমন করেই বা পাল্টাবে। দৈনন্দিন খরচের টাকা জোগাড় করতেই তো প্রাণান্ত অবস্থা! তাছাড়া কি-ই বা জমি ভাগে পেয়েছিলো। যা-ই বা পেলো তার আধাআধি বিক্রি করতে হলো সাজুকে কলেজে পাঠাতে। তবু রক্ষা, পরে আর লাগেনি। স্কলারশিপের টাকায় নিজে নিজেই পড়া চালিয়ে যেতে পেরেছে।

রাত নেমেছে। অনেকক্ষণ ধরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। নিঃসঙ্গ সালেহা হারিকেনের বাতিটা আর একটু উসকে দিলো। টিপ টিপ বর্ষণের শব্দ। টিনের চালে হালকা বর্ষার শব্দে আনমনা হয়ে গেলো সালেহা। থেকে থেকে ডাকছে কোলা ব্যাঙ।

এমনি একদিনে সালেহার মাথায় আশীর্বাদের হাত রেখে রেহান অস্ত্র তুলে নিয়েছিলো, যুদ্ধে গিয়েছিলো দেশের ডাকে। সাজু ছেলেবেলায় বাবার কথা জানতে চাইলে কি ভাবে বেপরোয়া গুলির মাঝে রেহান বাংকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের বুকে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিলো সে কথা বলত। কি ভাবে ডুব-সাঁতার কেটে পাকিস্তানি গানবোটে বিস্ফোরক বসিয়ে তীরে অপেক্ষা করছিল কখন বিস্ফোরণ ঘটে দেখার জন্য। বিস্ফোরণের পর আত্মরক্ষার্থে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ৭/৮ জন পাকিস্তানি বেঁধে নিয়ে এসেছিল রেহান সেদিন, শেষরাতে। সে এক তুলকালাম অবস্থা! সেক্টর কমান্ডার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে কেঁদে ফেলেছিল।

শুনতে শুনতে সাজু বলতো—মা, আমিও হবো, আব্বুল মতো।

সালেহা ওকে আদর করে বুকে নিয়ে বলতেন—পাগল ছেলে, যুদ্ধ তো শেষ। এখন তোরা স্বাধীন দেশটাকে ভাল করে গড়বি।

সাজু মা'র আঁচল ধরে বলতো—মা, স্বাধীনতা কী?

সালেহা ওর মাথায় বুলাতে বুলাতে বলতেন—নির্ভয় রাত্রি যাপন, নিঃসংকোচে কথা বলার অধিকার, ভালভাবে থাকা খাওয়ার প্রতিশ্রুতি। অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার নিশ্চয়তা, আরো কতো কি! তুমি বড় হলে সব বুঝতে পারবে।

সাজু ওর মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সম্মোহিত হতো। কথাগুলো বলতে বলতে মা'র চোখ জোড়া জ্বলে উঠতো। সাজু অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো।

তারপর সালেহার বুকে ছোট্ট মুখ লুকিয়ে বলতো—মা, আমলা কী এখন স্বাধীন?

মাথা দুলিয়ে সালেহা বলতো—হ্যাঁ বাবা, আমরা স্বাধীন। অন্তত কেউ এসে ঘর জ্বালিয়ে দেবার হুমকি তো দেবে না।

সালেহা কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে এল। সম্ভবত হারিকেনে কেরোসিন কমে এসেছে অথবা ভিতরের সলতেটা ছোট হয়ে গেছে। একবার হারিকেনটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকি দিল সে। মনে হলো তেল সলতে দু'টোরই আয়ু শেষ। অল্প আলোয় সাজুর ছোট্ট কোলবালিশটা তুলে নিল বুকের মাঝে। এখন আদর করছে বালিশটাকে। দু'ফোঁটা চোখের পানি গড়িয়ে পড়লো ওর। আস্তে আস্তে বলল—বাবা সাজু, তুমি ভাল থাক! তারপর এক সময় কোলবালিশটা আদর করে বুকের কাছে নিয়ে শক্ত বিছানায় গা এলিয়ে দিল সালেহা। হারিকেনের বাতিটা কেমন নিবু নিবু হয়ে এলো! বাইরে ক্রমশই বাড়ছে বর্ষণের বেগ।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলো আরো ছ'বছর। একটা নতুন আবিষ্কারে পৃথিবী আনন্দিত। মানুষের কোষের ক্ষয়প্রাপ্তি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নতুন সাফল্য। বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানী সাজেদুর রহমানের আবিষ্কার। পিএইচডি করতে করতে ড. হুবার্টের অনুপ্রেরণায় তার ল্যাবে কাজ করার সুযোগ পায় সাজু। কাজ পাগল হুবার্ট সাজুর প্রতিভা কাজে লাগিয়েছেন। এখন পৃথিবী

ওর অবদানে উপকৃত হবে। ফুলে ফুলে সাজান গাড়িতে করে অলকা ওকে আগলে আগলে ফ্লাটে নিয়ে এলো। সাদা মেয়েগুলো বড্ড বেহায়া। প্রতিভাধর কাউকে পেলে তার আশপাশে কেবল ছোক ছোক করতে থাকে!

অলকা ভাবছে, ওকে আরো সাবধান হতে হবে! গতকালই মা'র সাথে ঢাকায় কথা বলেছে। তাকে জানিয়েছে সাজুর দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির কথা। সাথে সাথে শাশুড়ির কথাও জানতে চেয়েছে। কারণ গত ক'দিন ধরে বারবার মা'র কথা জানতে চেয়েছে সাজু। অলকা বলেছে—চিন্তা করো না, মাম্মি ড্যাডি যার ভার নেন তিনি আরামেই আছেন। কোন অসুবিধা হলে ড্যাডি টেলিফোন করতো। তুমি মনোযোগ দিয়ে কাজ কর। লায়লা মেয়েকে সান্ত্বনা দিলো। না রে মা মনি, তুমি চিন্তা করো না। বেয়ান সাব ভালই আছেন। তা না হলে আমরা জানতাম।

অলকা কিছুটা অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলো—অর্থাৎ আমার শাশুড়ি তাহলে তোমাদের কাছে নেই!

আমতা আমতা করতে করতে লায়লা বললো—গ্রামের মানুষ, গ্রামই তাঁর পছন্দ, তাই চলে গেছেন। আটকানটা ঠিক হতো না। তা তুমি কী বলো মা-মনি?

ঝিম ঝিম করছে অলকার মাথা। সে জানে সাজু তার মাকে কতো ভালবাসে। বললো—বরং তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁর খবর নাও। পারলে ঢাকায় আনাও। আমরা দিন পনেরো'র মধ্যে চলে আসব। বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে ওকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা কার্ড পেয়ে গেছি।

তাই নাকি রে। লায়লার কণ্ঠে উপচে উঠা খুশির তরঙ্গ। বললো—আমাদের তারিখ জানা, এয়ারপোর্টে তোদের আনতে যাবো।

তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, আমরা স্টেট গেস্ট হিসাবে আসছি। সরকারি অনুষ্ঠান শেষে বাসায় আসবো। আর শোন, আমার শাশুড়িকে আনাও, তা না হলে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। সাজু কিন্তু আগের মতোই আছে। আমি শুধু তোমাদের দোহাই দিয়ে ওকে বুঝিয়ে রাখছি।

আচ্ছা, আচ্ছা মা, তুমি চিন্তা কর না, আমরা দেখছি।

মা'র কথায় অলকা সান্ত্বনা পায় নি। পরিবেশের পরিবর্তনেও সাজুর আচরণে কোন পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। যখনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসরে দু'জন বসে গল্প করে তখন সাজু ওর প্রয়াত পিতা রেহানের কথাই বলে বেশি। তিনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে গেলেন, কিভাবে শহীদ হলেন, ওর মা কত কষ্টে ওকে বড় করেছেন।

একবার অলকা বলেছিল—তুমি বড্ড সেকেলে সাজু, আমেরিকার এই মনোরম পরিবেশে কেউ শুধু মা মা করে? তুমি তো আমার কথা একবারও বলো না।

ওর কথা শুনে সাজু হাসে। বলে—তুমি আছো তাই আমি আজ এখানে। তোমার হাতের ছোঁয়ার মধ্যে বসে গল্প করছি। আর খেয়ে না খেয়ে মা আমাকে ভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন। তবে ভরসা, মাকে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি দেখছেন।

আজকে অনুষ্ঠানের ঝামেলা চুকিয়ে বাসায় এসে সাজু পাজামা পাঞ্জাবি পরে বসলো। বললো—আলো, বড্ড ক্লান্তি লাগছে, সারাদিন ধকল গেছে খুব। অলকাকে সাজু আদর করে আলো ডাকে।

অলকার মুখে তৃপ্তির হাসি। বললো—বিখ্যাত হয়েছো। এখন তো আমারই মুশকিল হবে তোমাকে কাছে পাওয়া।

না, মুশকিল হবে না, একটা ছোট্ট সোনামনি নিয়ে ঘরটা ভরে ফেলবো একরাশ হাসি কান্নায়। বলে সাজু ঘুরে তাকায় অলকার দিকে। হাসে দু'জনেই। ওদের মুখে পরম তৃপ্তির ছাপ।

অলকা হাসতে হাসতে বললো—এই বুঝি তোমার প্ল্যান? কবে থেকে এ ভাবে ভাবতে শুরু করেছ?

সাজুর চোখে দুষ্টামির হাসি। বললো—ভাবছি বেশ কিছুদিন ধরেই। তা ছাড়া মাকে স্বপ্নে দেখলাম, কেমন যেন অসহায় মনে হলো। বললেন—বাবা, তোর বড় হওয়া শেষ হবে কবে? না হয় আমাকে একটা ছোট্ট সাজু দে। আমিও এখানে একা, তুই তো কাছে নেই। অলকা একটু ভড়কে গেলো। বললো—হু! তা আর কোন স্বপ্ন টপ্ন দেখ না, খালি মাকে দেখ।

সাজু একটু বিমর্ষ হলো। চোখে দুঃখ দুঃখ ভাব। বললো—জান অলকা, হঠাৎ একজন লোককে স্বপ্নে দেখলাম কালকে। বাবাকে কোন দিন দেখি নি, শুধু গল্প শুনেছি। শুনতে শুনতেই কল্পনায় একজনকে বাবা বানিয়ে ফেলেছি। দেখলাম এক লোকের কাঁধে রাইফেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। মনে হলো একটু ছুঁয়ে দেখি, কিন্তু হাত বাড়াবার আগেই তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন— আমি ভাল আছি, তুমি দূরে চলে আসায় তোমার মা একলা হয়ে গেছে, আমি তাকে নিয়ে যাবো।

আমি কিছুটা ভয় আর শ্রদ্ধা মিশান গলায় বললাম—আপনি কে? আপনাকে আমার কেন এমন আপন আপন লাগছে?

অলকা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বললো—তারপর?

সাজু বললো—জবাব শুনে আমি হতবিহবল হয়ে গেলাম। আগন্তুক একটু হেসে বললেন—আপনজনকে তো আপন লাগবেই। আমি ওনার দিকে হাত বাড়াতেই হঠাৎ দেখি নাই হয়ে গেলেন। বলতে বলতে সাজুর কণ্ঠ ধরে এলো, কি এক সব হারাবার ব্যথায়।

অলকা বললো—চলো, ঘুমিয়ে পড়ি। অনেক খাটুনি গেছে আজ। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। সাজুর হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে গেলো। আদর করে চুলটা এলোমেলো করে দিলো। বললো—লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়। আমার আসতে লাগবে মাত্র পাঁচ মিনিট।

মা'র স্বভাব পেয়েছে অলকা। শুতে যাবার আগে সামান্য সেজেগুজে একটু পারফিউম মাখে। অবশ্য খুব ভাল কাজ দেয় এটা। সাজুর মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

আজও তার ব্যতিক্রম হলো না যখন অলকা হালকা নীল আলোটা জেলে ওর কাছে এসে শুয়ে পড়লো, সাজু ওর মাথাটা আদর করে টেনে নিলো। আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে থাকলো অলকাকে। আর অলকা প্রার্থনা করতে লাগলো ওর এই বিমূর্ত মুহূর্তগুলো যেন কখনো ফুরিয়ে না যায়।

৮

বিগত ছ'বছরে সালেহার শরীর ভেঙে গেছে। প্রায়ই জ্বর থাকে। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। কাশি হয়েছে, কাশতে কাশতে শরীর ভাঁজ হয়ে আসে। বছর খানেক ধরে লোকজনের ঘরে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শীতের দিন হলে সে একটা তালি দেয়া চাদর গায় দিয়ে রোদ পোহায় সামনের উঠানে আর বর্ষণ হলে বসে থাকে ঘরের বারান্দায়। চোখ থাকে সামনে, পথের দিকে। মনে হয় আহা যদি হঠাৎ সাজু আসতো! বুঝতে পারে না সাজু কতো দূরে! যেমন করে যুদ্ধের আতঙ্কের দিনগুলিতে রেহানের ফেরার প্রত্যাশায় বসে থাকতো। ঠিক তেমনি করে বসে থাকে সালেহা তার সন্তানের জন্য।

রমিজদের অবস্থা আরো উন্নতি হয়েছে। রমিজ এবার চেয়ারম্যান পদে ইলেকশন করবে। ওর বাবা এক সময় পিস কমিটির মেম্বার ছিলো। ঐ সময়ই কিছু টাকার মুখ দেখে রমিজরা। মুক্তিবাহিনী রমিজের বাবাকে শাস্তি দেয়ার জন্য বড় কড়াই গাছের নিচে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখে। রেহান রাঙাভাই বলে ডাকতো তাকে। তারপর থেকে অবশ্য রাঙাভাই যুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত এলাকায় আর মুখ দেখায়নি।

রমিজের মা স্মৃতিগুলো মনে হয় কিছুটা মনে রেখেছে। ছোট ছোট কাজ জোগাড় করা, কাছে বসে গল্প করা, মাঝে মধ্যে এটা সেটা খেতে দেওয়া, এতে রমিজের মা'র জুড়ি নেই। সে ছাড়া আর কারও সাথে সালেহা এখন তেমন একটা কথাও বলেন না।

আজকে পুরান একটা বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ রেহানের একটা ছবি পেলেন সালেহা। বাইরে টিপ টিপ বৃষ্টি। অনেকক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে। সেই উজ্জ্বল চোখ, সেই মুখ, সেই হালকা গোঁফের রেখা। সালেহা আস্তে আস্তে বুকের কাছে চেপে ধরলেন ছবিটা। রেহান একটা গান বড্ড পছন্দ করতেন। কখনো কখনো গলা ছেড়ে গাইতেন আর তন্ময় হয়ে শুনতেন সালেহা-

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছে
দেখতে আমি পাইনি তারে—দেখতে আমি পাইনি

মনে হলো রেহান গাইছেন সেই গান, খুব কাছে বসে গাইছেন। চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে সালেহার। অনেক ছোট ছোট মিষ্টি ঘটনা। ভাসছে চোখের সামনে। যেন এইতো সেদিন, দু'জনে হাত ধরাধরি করে এই উঠানে চাঁদের আলোয় বসেছিল,

শীতের দিনে রেহান রসের পিঠা খেতে ভালবাসতো। তাঁর স্বভাব ছিলো প্রথমে নিজ হাতে সালেহাকে খাওয়াবে তারপর নিজে খাবে। বাড়িতে লোকজন বেশি থাকলে রেহান আড়ালে আবডালে এই কাজটা সারতো। একদিন পিঠার প্লেট হাতে নিয়ে রেহান ঘুরছে, রেহানের খালা কোত্থেকে এসে হাজির। বলে, বউমা এটা কর, ওটা কর। এক ফাঁকে তবু সালেহা দৌড়ে এসে রেহানের সামনে দাঁড়িয়েছে। যেই রেহান পিঠা ভেঙে ওর মুখে দিলো অমনি ওর খালা হাজির। এসে বললেন—বউমা, কই গেলা?

সালেহা কথা বলতে পারছে না, মুখে পিঠা। ভড়কে যাওয়ায় রেহানের হাতের প্লেট মাটিতে পড়ে সে এক কাণ্ড আর কি। রেহানের খালা বলে, ওমা একি, এতো দেখি লায়লি-মজনু।

আজকে ঘরে তেমন কোন খাবার নেই। উঠতে বসতে কষ্ট হচ্ছে সালেহার। তবুও তো জীবন থেমে থাকে না। বৃষ্টি কমছে ধীরে ধীরে। উঠে কাশতে কাশতে ঘরের মধ্যে গেলেন সালেহা। না, জ্বরটা মনে হয় বাড়ছে ! দুপুরে কোন রকমে আলু ভাতে সেদ্ধ করে খেয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চারদিকে সাজুর খেলনা, কোল বালিশ, ছোট বড় কাপড়। একবার ওর একটা ছোট্ট শার্ট ধরে গন্ধ শুকল কিছুক্ষণ। ক্লান্তিতে চোখটা বুজে আসছে।

হঠাৎ মনে হলো রেহান এসেছে। মনে হলো উঠানে একলা বসে আছে সালেহা। রেহান সোজা এসে ওর সামনে দাঁড়ালো। সালেহা উঠতে চাচ্ছে কিন্তু কেন যেন পারছে না। ওর পাশে এখন রেহান ছাড়া আর কেউ নেই। সালেহা ওঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অভিমানে গলা ভারি করে বললো—এতো দিনে আমার কথা মনে হলো ! আর আমি তোমার জন্য রসের পিঠা বানাব না। আবেগে ওর ভারি কণ্ঠ বুজে আসছে।

রেহান বললো—তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। তুমি বড্ড একা হয়ে গেছ, তাই তোমাকে নিতে এসেছি। এখন থেকে শুধু তুমি আর আমি থাকবো আর কেউ থাকবে না।

আমার সাজু!

রেহান বললো—পারবে। তারপর বললেন—চলি এখন, এরপর আমরা একত্রেই থাকবো।

ঘামতে ঘামতে উঠে বসলো সালেহা। সারা শরীর জব জব করছে ঘামে। মনে হলো এই মাত্র রেহান এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বিছানা ছাড়লো সালেহা। ওজু করে আছরের নামাজ আদায় করলো। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে রোদ। বেলা পড়ে এসেছে। এখন হাঁটতে লাঠি লাগে, যদি একটু দূরে যেতে হয়। ভাবলেন, অনেকদিন রেহানের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যাই না। আজ একটু যাই, দেখে আসি ও কেমন আছে !

ডান হাতে লাঠি আর বাম হাতে রেহানের ছবি এবং সাজুর ছোট্ট কোল বালিশ। আস্তে ধীরে বের হলেন ঘর থেকে সালেহা। হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। শরীর কাঁপছে।

না আজ সালেহা থামবে না। অনেকদিন পর রেহানের সাথে ওঁর কথা হয়েছে। তাঁর স্মৃতির কাছে থেকে ওকে ঘুরে আসতেই হবে।

সালেহা যখন স্কুলের খোলা মাঠের পাশে স্তম্ভের কাছে পৌঁছুল তখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে। কপালে চিকন ঘাম। স্মৃতি, এখানেও যেন কেমন পুরনো হয়ে গেছে। কোন সংস্কার নেই। সেই প্রথম যেদিন এসেছিলো এখানে, সাজু একদম ছোট্ট। চকচকে স্মৃতিস্তম্ভের ওপর আছাড় খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলো সালেহা! অনেক বছর আগের কথা। এখন খুব ক্লান্তি লাগছে। ধীরে ধীরে বসলো। সাজুর কোল বালিশটা সামনে রেখে তার উপর রেহানের ছবিটা রাখলো যত্ন করে। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়লে ভাল লাগবে। কেমন যেন গা গুলিয়ে আসছে বারবার। কেমন যেন একদম টক টক লাল হয়ে গেছে সূর্যটা। ওটা কী অস্ত যেতে বসেছে!

যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে সালেহা। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সালেহা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে জীর্ণ শহীদ স্তম্ভের দিকে। লেখা আছে বীর মুক্তিযোদ্ধা রেহান আশরাফ স্মরণে। অনেক জায়গায় ভেঙে চুরে গেছে। না, সালেহা আর বসে থাকতে পারছে না। শুয়ে পড়লো সে। বুকে আঁকড়ে ধরলো রেহানের ছবি আর সাজুর ছোট্ট বালিশ। দূরে আরো দূরে কোথাও কি কেউ কাঁদছে। আহা, সাজু নাতো! ওর কী দুধ খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে ! আহা, সাজু কি আছাড় খেলো! না বাবা কাঁদে না। ছি, লক্ষ্মী ছেলে। হঠাৎ মনে হলো মাথার ওপর রক্তিম সূর্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

সাজু ঢাকা বিমান বন্দরে লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে। জার্নালিস্ট আর ফটোগ্রাফারদের ভিড়। ওর বাম পাশে অলকা হাঁটছে হাসিমুখে, গর্বিত ভঙ্গি। একের পর এক ফ্ল্যাশ জ্বলছে। ঢাকার আকাশে সূর্য তখন পাটে বসেছে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সাজুর মনে হলো মা বলছেন—বাবা, তুই এসেছিস!

এক জার্নালিস্টের কথার জবাবের মাঝে হঠাৎ ও চমকে উঠলো। গলা চাপা আর্তনাদের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো —মা! হ্যাঁ আমি, আমি এসেছি।

সাংবাদিকরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে।